ছবিলাল

এলাহাবাদে গিয়ে প্রথম ক'টা মাস বড় কষ্টে কেটেছে আমাদের। প্রথমতঃ বাড়ির সমস্যা। আমার স্বামী তখন ফ্লাইট্ লেফ্‌টেন্যান্ট্। শুনলাম এয়ারফোর্স ক্যাম্পে বাড়ি পেতে অন্তত ছ'মাস লাগবে। ততদিনে শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হবে। চেষ্টা চরিত্র করে একটা বাড়ি পাওয়া গেল; সাড়ে তিনশো টাকা ভাড়া। পরে অবশ্য টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে, কিন্তু সরকারের ব্যাপার। দরখাস্ত ধাপে ধাপে উঠে যথাযোগ্য স্থান থেকে স্যাংশন পেতে সময় লাগবে। ততদিন আমাদেরই টাকা গুনতে হবে মাসে মাসে।

এর উপর আমার দুই ছেলে তখন দেওঘরে বোর্ডিং'এ; তাদের পেছনেও খরচ কম নয়। ঠিক করলাম এ ক'টা মাস আর ঝি-চাকর রাখবো না, অন্তত কিছুটা সাশ্রয় হবে। দু'টো মানুষের সংসারে কিইবা কাজ, কিছুই অসুবিধে হবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয়। কাপড় কেচে আর বাসন মেজে মেজে হাতে হাজা হয়ে যাওয়ার যোগাড় হলো। মোটা শরীর, নীচু হয়ে ঘর মুছতে কোমরে ফিক্ লাগে, হাতে পায়ে খিল ধরে যায়। মেজাজ সবসময় সপ্তমে চড়ে থাকে, কর্তার সঙ্গে কথায় কথায় তুমুল ঝগড়া বাধে। ভাল মনে কোন কথা বললেও মনে হয় বুঝি আমায় খোঁটা দিয়ে বলছে।

এই করে কোনরকমে দেড়টা মাস কাটলো। হঠাৎ একদিন আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরলো একগাল হাসি নিয়ে। কি ব্যাপার, না, ওদের কয়েক- জন অফিসারের পোস্টিং অর্ডার এসেছে। ক্যাম্পে অনেকগুলো ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে একসঙ্গে, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই নতুন বাড়িতে যেতে পারি। এরপর ক'দিন প্যাকিং'এর ফাঁকে ফাঁকে শুধু ওই কথা আলোচনা করে কাটলো। একদিন আমাদের ভাগের ফ্ল্যাটটা দেখেও

এলো ও। সঙ্গে আরেকটা সুখবর আনলো। শুধু বাড়ি নয়, ঝি-চাকরের সমস্যারও সমাধান হবে এবার। ওই বাড়িতে আগে যারা থাকতো, তাদের ঝি ও তার স্বামী এখনও সারভেন্টস্ কোয়ার্টার ছাড়েনি। লোকটার নাম ছবিলাল। সে আমার স্বামীর কাছে অনুমতি চেয়েছে কোয়ার্টারে থাকার। বলেছে যে ওর বউ পার্বতী আমাদের বাড়ি কাজ করবে, প্রয়োজন হলে ছবিলালও দু'চারটে কাজ করে দিতে পারবে। অবশ্য একটা বাঁধা চাকরি আছে ওর। বলা বাহুল্য, সানন্দে রাজী হয়েছে আমার কর্তা।

আমরা যখন মালপত্র নিয়ে ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঘন্টা দু'য়েক, না হলে আরও আগে আসা যেতো। ট্রাকে ড্রাইভার ছাড়া আরও একটা লোক ছিল। আমরা স্কুটারে এলাম। কর্তা ও লোক দু'টো ধরাধরি করে জিনিসপত্র নামাচ্ছে, ইতিমধ্যে আর একজন লোক এসে হাত লাগালো। লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মাঝারি গড়ন। মিশকালো রঙ যেন চক্‌চক্ করছে। বেশ সৌম্য, ভদ্র চেহারা। তবে টেরিকটের ট্রাউজার ও বুশ-শার্টের সঙ্গে মাথায় তেলের প্রাচুর্যটা একটু বিসদৃশ দেখাচ্ছে। আমার স্বামী ওকে কোন্ জিনিস কোথায় রাখতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে লাগলো।

শুনলাম এই নাকি ছবিলাল। অবাক হলাম। লোকটার চেহারা ও সাজ-পোশাক দেখে চাকর-বাকর ক্লাসের মনে হয় না।

চাপা গলায় কর্তাকে এ কথা বলতে ও বললো, "তোমরা বাইরে যতই আধুনিক সাজো না কেন, মনের গোঁড়ামি গেল না। ম্যাডাম, যুগ বদলে গেছে। এ লোকটা সরকারী কাজ করে। সুইপার হলেও কমপক্ষে পৌনে দু'শো টাকা মাইনে পায়, হয়তো অন্যান্য অ্যালাউন্সও আছে আরও। অনেক কেরানী, মাস্টারের থেকে ভাল অবস্থা এর। আগেকার দিনে জামাকাপড় দেখে বোঝা যেতো, কে ভদ্রলোক আর কে ভদ্রলোক নয়। এ যুগে সে মাপকাঠি অচল।"

জিনিসপত্র নামানো শেষ হলো। টাকা নিয়ে ফিরে গেল ট্রাক। ছবিলাল একটু কুন্ঠিতভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললো, "পার্বতী তো বাড়ি নেই, শহরে বোনের বাড়ি গেছে। রাত

হবে ফিরতে। যদি কোন কাজ থাকে তো বলুন, আমি করে দিই।"

রাত্রে আমাদের মুখার্জীদের বাড়ি নেমন্তন্ন, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা নেই।

বললাম, "এখন আর কিছু কাজ নেই, কাল সকালে পাঠিয়ে দিও ওকে।"

পরদিন সকালবেলা চায়ের সঙ্গে রুটি-মাখন-ডিমসিদ্ধ খেয়ে কর্তা অফিস গেছে। এক কাপ চা ও প্লেটে দু'টো টোস্ট নিয়ে আলসেমি করে বসে আছি। রাজ্যের কাজ বাকী। বাড়িঘর অগোছালো থৈ থৈ করছে। এমন সময় ঝুম্ ঝুম্ করে মল বাজিয়ে একটি মেয়েলোক এসে সামনে দাঁড়ালো। ও অফিস যাওয়ার পর দরজাটা আর বন্ধ করা হয়নি।

নমস্কার করে মুচকি হেসে বললো, "জী, ছবিলাল ভেজা।"

বুঝলাম আমার হবু ঝি। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। মিশকালো রং, ঠোঁট দুটো পানের রসে টুকটুকে লাল। পরনে সস্তা বাহারে ছাপা সাড়ি বেশ উঁচু করে পরেছে, বোধহয় পায়ের মল যাতে ঢাকা না পড়ে যায় সেই জন্যে। হাতভরা সোনালী কাঁচের চুড়ি, চোখের কোনে মনে হলো কাজল টেনেছে। বয়স বছর ত্রিশের কম নয়, তবে বেশ আঁটসাট স্বাস্থ্য। চেহারায় লাবন্যশ্রী না থাকুক, চটক আছে। দু'চারটে মামুলী প্রশ্ন করে জেনে নিলাম কি কি কাজ পারে, বাড়িতে কে কে থাকে ইত্যাদি। শুনলাম ছেলেপুলে হয়নি, স্বামী-স্ত্রী দু'টি প্রাণী শুধু। বেশ চালাক-চতুর মনে হল। দু'চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

অবশ্য আমার তখন খুঁটিয়ে বিচার করার মত মনের অবস্থা নয়। ঝি যে একটা জুটেছে অবশেষে, সেটাই পরম সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। রান্না-বান্না ছাড়া উপরি সব কাজ করবে। মাইনে তিরিশ টাকা, সকালের নাস্তা, তা ছাড়া কোয়ার্টার। খবর নিয়েছি, এখানকার নাকি এই রেট। তখনই ঝাঁট-পাট শুরু করে দিলো। দু'জনে ধরাধরি করে জিনিসপত্র সরিয়ে বসার ঘর, রান্নাঘর ও একটা বেডরুম একটু ভদ্রস্থ করলাম। ভালভাবে গোছগাছ করতে আরও কিছুদিন লাগবে।

কয়েকদিন কাজ দেখে বুঝলাম, মোটামুটি ভাল ঝি-ই পেয়েছি। বেশ চটপটে ছিমছাম। তা ছাড়া, দরকার মত ডাক দিলেই পাওয়া যায়, বাচ্চাকাচ্চার ঝক্কি নেই। সেদিন স্কোয়াড্রন-লিডার ঘোষের বাড়ি বসে ঝি'র গুণগান করছিলাম। কোমরের ব্যথাটা এতদিনে সেরেছে। হাত দু'খানা লোকের সামনে বার করতেও সংকোচ বোধ করি না আজকাল। বোধহয় এই সব কারণেই উচ্ছ্বাসটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছিল।

ঘোষ সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "দেখুন মিসেস রায়, নতুন ঝি আর নতুন বউ চেনা বড় মুশকিল। পুরনো হলে তবেই এদের আসল রূপটি ধরা পড়ে। কি বল হে রায়? কথাটা ঠিক বললাম কিনা?

আমার কর্তা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললো, "সে আর বলতে!"

আমি আর মিসেস ঘোষ কোমর বেঁধে বউদের ডিফেন্সে নামলাম।

কথাটা কিন্তু ভদ্রলোক সেদিন ভুল বলেননি। কিংবা হয়তো ভাল জিনিসও অভ্যস্থ হয়ে গেলে আর তত ভাল লাগে না। যে কারণেই হোক, ক্রমশ পার্বতীর নানা দোষ-ত্রুটি চোখে পড়তে লাগলো। সবচেয়ে যেটা গায়ে লাগতো, সেটা তার মুচকি হাসি।

কাজ শুরু করার মাসখানেক পরের কথা।

হাসি হাসি মুখ করে এসে দাঁড়ালো, "জী, একটা জিনিসের দরকার ছিল।"

কি ব্যাপার, না, ছবিলাল বলেছে মেস থেকে দু'বোতল "রাম্" আনিয়ে দিতে, যা দাম পড়বে মাইনে থেকে কেটে নিই যেন। অবাক হলাম, "রাম" কি করবে সে? মুচকি হেসে বললো, ছবিলাল খায়। পুরুষমানুষ, সন্ধ্যেবেলা একটু মদ না হলে চলে না। খোলা বাজারে যা দাম, মেসে তার অর্ধেক দামে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয়, সেটা শুধু অফিসারদেরই প্রাপ্য। তার স্বামী যদিও কম্যাণ্ডের "সীফর" (সুইপার), তবু অফিসার রূপে গণ্য নয় সে। সাহেব একটা "চিট্" লিখে দিলেই দু'বোতল অনায়াসে পেতে পারে সে। মেজাজটা একটু খিচড়ে গেল।

বললাম, "দ্যাখো, আমাদের বাড়ি মদ-টদ কখনো আসে না, ওসবের খবরও রাখি না আমরা।"

পার্বতী শুধু মুচকি হেসে ঘাড় নাড়লো। হাসিতে অবজ্ঞার রেশ দেখলাম যেন।

আর একদিন সকালের কাজ শেষ করেছে, এবার যাওয়ার কথা। দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ কাটছে। কি ব্যাপার?

"মেমসাব্, পঞ্চাশটা টাকা দেবে?"

অবাক হলাম। মাসের শেষ, হঠাৎ টাকা কোথা থেকে বার করবো? তা ছাড়া, ওর বর ভাল মাইনে পায়। পার্বতী আমাদের এখানে তিরিশ টাকা পায়, ফ্রি-বাড়ি, নাস্তা। ছেলেপুলে নেই, দু'জনে অত টাকা করে কি?

পার্বতী ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "ঠিক বলেছো মেমসাব্, আমাদের পয়সার ভাবনা? আমার স্বামী সীফর্, ও কিছু কম মাইনে পায় না। সব ওই বদমাইশ মেয়েমানুষটার শয়তানী।"

তারপর হাত-পা নেড়ে এক বিরাট কাহিনী শোনালো ----।

ওরা নাকি আগে বেগমবাজারে থাকতো, ছবিলালের বাবা-মা'র সঙ্গে। ওদের নিজেদের পাকা বাড়ি আছে সেখানে। ছবিলাল সাইকেল করে কাজে আসতো। ওদের বাড়ির কাছে এক বানিয়া থাকতো, তার বউ আর একটা বছর-বারোর মেয়ে নিয়ে। বউটা সাক্ষাৎ ডাকিনী। বয়স চল্লিশের বেশী বই কম নয়, কিন্তু বুড়ির সে কি বাহার ! বুড়ো বানিয়ায় মন ভরতো না, নজর পড়লো ছবিলালের উপর। নানা ছুতো-নাতা করে ডেকে ডেকে সুর্মাটানা চোখ নাচিয়ে সে কি গল্প-রসিকতা। তবে পার্বতীর আদমী ওরকম লোক নয়। যেই মাগীর আসল মতলব টের পেয়েছে, অমনি মেলামেশা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু বানিয়ার বউ তখন ক্ষেপে গেছে।

ওরা প্রথমটা ভেবেছিল, কিছুদিন ছোঁক ছোঁক করে নিজেই শান্ত হয়ে যাবে, হয়তো অন্য শিকারে মন দেবে। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন পুলিস এসে হাজির। বানিয়া আর তার বউ ছবিলালের নামে রিপোর্ট করেছে পুলিসে ---- এখনও কেস চলছে ----। এতদূর বলে থামলো পার্বতী। মলপরা পায়ের নখ দিয়ে মেজে খুঁটতে লাগলো।

"কিসের কেস?"

চোখ নীচু করলো পার্বতী, "কি বলবো, ঘেন্নার কথা মেমসাব্, ওদের মত শয়তান দুনিয়ায় নেই। বলে কিনা, আমার আদমী ওর মেয়ের সর্বনাশ করে দিয়েছে - সময়ে ছেলেপুলে হলে ওই বয়সী মেয়ের বাপ হত সে। এখনও কেস ঝুলছে, আর তার খরচ যোগাতে প্রাণান্ত হচ্ছে আমাদের ----।"

পার্বতীকে দশটা টাকা দিয়ে তখনকার মত বিদায় করলাম, কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগতে লাগলো। কি বিচ্ছিরি কাণ্ড ! 'রেপ' কেসের আসামী আমাদের সারভেন্টস্ কোয়ার্টার জুড়ে বসে রয়েছে ! লোকে শুনলেই বা বলবে কি ! কর্তা বাড়ি আসতেই সব বললাম। ওদের কি রাখা সমীচীন? ও কিন্তু লঘু ভাবে উড়িয়ে দিলো কথাটা।

বললো, "পার্বতী গাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, কি উলটোপালটা বলেছে। 'রেপ' কেস হতেই পারে না। সরকারী কাজ করে ছবিলাল। সে সব মামলা হলে, ওকে কবে সাসপেণ্ড করে দিতো। তা ছাড়া, ক্যাম্পে থাকার অনুমতি পেতো না গার্ডরুম থেকে।"

ওর কথা শুনে খানিকটা আশ্বাস পেলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ হালকা হলো না মন। স্বামীর এমন কলঙ্কের কথা কি শুধু শুধু বানিয়ে বলতে পারে কেউ, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটনা আছে এর পেছনে। কিন্তু এ বিষয়ে কাকে আর জিজ্ঞেস করবো? ছবিলাল লোকটাকে কিন্তু ও ধরনের মনে হয় না। আকর্ষক চেহারা সন্দেহ নেই, তবে মানুষটা ভদ্র, সংযত বলেই মনে হয়। বরং পার্বতীরই হাবে-ভাবে চটুলতার ঝলক।

এর পর পার্বতীর আবার আর এক রূপ। সেদিন রবিবার। ছুটির দিনে ও আটটার আগে আসে না, আমিই বলে দিয়েছি। সেদিন দশটা বাজে, শ্রীমতীর দেখা নেই। কলিং-বেল টিপে টিপে আঙুলে ব্যথা হবার জোগাড়। সাড়ে দশটা নাগাদ ছবিলাল এলো, পার্বতীর নাকি ভীষণ 'শির মে চক্কর', অতএব আজ ও-ই ওর কাজগুলো করে দেবে। আমি বরাবর ঝি দিয়েই কাজ করিয়েছি। একটা হুম্‌দো পুরুষমানুষ খালি বাড়িতে ঘুটঘুট করে পাশে ঘুরবে, ভাবতেই কিরকম লাগে। তবে সেদিন কর্তা বাড়িতে ছিল, আপত্তি করলাম না। ছবিলাল ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ

কাজ করতে লাগলো। দেখলাম, পার্বতীর থেকে বরং ভাল করেই করলো।

এরপর থেকে প্রায়ই কাজে কামাই শুরু করলো পার্বতী। সেই এক ধূয়ো - শির মে চক্কর। ছবিলাল ডিউটির ফাঁকে একসময় এসে খানিকটা কাজ সেরে যায়। এমনি জোড়াতালি দিয়ে চললো কিছুকাল। মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম। পার্বতীকে এই নিয়ে একটু বকাবকি করবো ঠিক করলাম, কিন্তু তার দর্শন পেলে তো? চারদিন ধরে এক-নাগাড়ে তার "চক্করের" জেরই থামছে না। অবশেষে একদিন এলো। ঝলমলে শাড়ি, টিপ, ঝুমকো, কাজলে রূপ খোলতাই করে। আমি কিছু বলার আগে ও নিজেই শুরু করলো। ওর পেটে বাচ্চা এসেছে। দোতলার সিঁড়ি ভেঙে কাজে আসতে পারবে না আর। ছবিলাল অবশ্য ডিউটির ফাঁকে কিছু কিছু কাজ করে যাবে। মেমসাব্ বললে ও উপরি-কাজের জন্যে লোক ঠিক করে দেবে কয়েক মাসের মত।

"ক'মাসের পোয়াতি তুই?"

"তিন মাস।"

নবাবী দেখে গা জ্বলে গেল। এর আগে যতগুলো ঝি দেখেছি, প্রসব-বেদনা শুরু হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ করেনি। আবার আট-দশ দিনেই আঁতুর ছেড়ে কাজে লেগেছে। পার্বতী তখনও লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে চলেছে। ওর শাশুড়ির নাকি ভীষণ নাতির শখ। গত দশ বছর ধরে কত জায়গায় মানত করে, মাথা কুটে, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েছিল। আড়ালে নাকি ছবিলালকে আরেকটা বউ আনার জন্যে অনেক সাধ্য সাধনা করেছে।

"কিন্তু আমার মরদ সেরকম নয় মেমসাব্। তাছাড়া সরকারী চাকরি, আর একটা বিয়ে করলেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি খতম। তারপর সে বউ বছর বছর বিইয়ে ওর ঘর ভরলেও, কিছু সুবিধে হবে না। খাওয়াবে কি ওদের?" বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকে পার্বতী।

পৌষমাসের মেলায় নাকি কে এক সাধু এসেছিল। গাঁয়ের যত বাঁজা মেয়েমানুষ ঝেঁটিয়ে গেছিল সেই সাধুর দর্শন করতে। সবাইকে এক পুরিয়া করে "চুরণ্" দিয়েছে সাধু। সে "চুরণ্" নাকি অব্যর্থ। প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি পার্বতীর, কিন্তু সেই "চুরণ্" খাবার কিছুদিন পর থেকেই সে

কি চক্কর! পার্বতী চোখ বুজে হাত দু'টো বার বার কপালে ঠেকালো।

এর পর পার্বতী আর আসতো না। ছবিলাল সকালে এসে ঝাঁটপাট, বাসন মাজা শেষ করে চলে যেতো। বিকেলে এসে আরও দু'চারটে ছুটকো কাজ করতো। আমাদের ছাদ থেকে সারভেন্টস্ কোয়ার্টার দেখা যায়। যখনি দেখি, পার্বতী ঘরের সামনে চারপাইয়ে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। বেশভূষা তেমনি পরিপাটি। ছবিলাল ভোরবেলা স্টোভে চা, নাস্তা বানিয়ে বউকে খাইয়ে কাজে যেতো। ডিউটির এক ফাঁকে এসে দুপুরের রান্না-বান্না করতো। পার্বতী সারাটা দিন চারপাইয়ে পানের ডিবে নিয়ে কাটাতো। রাগে পিত্তি জ্বলে যেতো আমার। স্বামীটাকে ভালমানুষ পেয়ে খুব সুখ করে নিচ্ছে। ছবিলালের কি দুর্ভাবনা ! কি করে যে বউয়ের একটু আরাম হবে, সব সময় সেই চিন্তা তার।

আমাদের প্রতিবেশী ফ্লাইট্ লেফটেন্যান্ট রাও তেজপুরে বদলী হলো। ওদের বাড়ি বছর-পনেরোর একটা মেয়ে কাজ করতো। সাদাসিধে ছেলেমানুষ, হাসিমুখে সারাদিন ধরে টুকটুক করে কাজ করে যেতো। আমি লছমীর মাকে ডেকে পাঠালাম।

বললাম, "পার্বতী তো বেশ ক'মাস কাজ করতে পারবে না মনে হচ্ছে।

ডেলিভারির পরও কাজ করবে কিনা কে জানে। তোমার মেয়েকে উপরি কাজের জন্যে রাখতে চাই ----।"

ওর মা খুশীই হলো।

কয়েক মাস পরের কথা। জুন মাসের মাঝামাঝি তখন। কর্তা সবে অফিস গেছে। হঠাৎ ডোর-বেলটা কর্কশ সুরে একটানা বেজে চললো, সেই সঙ্গে দুম্ দুম্ করে দরজায় আওয়াজ। দরজা খুলতেই পাড়ার জন-চারেক আয়া হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। শুনলাম, পার্বতীর নাকি কাল সন্ধ্যে থেকে প্রসব-বেদনা শুরু হয়েছে। সারারাত্রি সমানে কাতরেছে। ক্যাম্পের বুড়ী ঝি মার্থার এসব ব্যাপারে হাতযশ আছে। ক্যাম্পের অনেক ঝিকেই খালাস করেছে সে। আগের থেকে বলা ছিল তাকে। বুড়ী সারারাত পার্বতীর কাছে ছিল। পনেরো ঘন্টা হয়ে গেল এখনও প্রসব হল না। মার্থা বলছে প্রসূতির অবস্থা নাকি মোটেই ভালো

মনে হচ্ছে না তার।

পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। গিয়ে দেখি ছোট্ট খুপরি ঘরখানা নানা বয়সী আয়াদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। মাঝখানে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে পার্বতী। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। কালো হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো, দর দর করে ঘাম ঝরছে কপালের দু'পাশ দিয়ে। দু'তিনটে মেয়েলোক কেউ ওর উরোদ, কেউ হাত, কেউ পেট মালিশ করছে। দেখে মাথাটা কিরকম ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠলো।

ওদের বললাম, "আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে ফোন করে দিচ্ছি। তোমরা একজন আমার সঙ্গে এসো। দুধ আর গ্লুকোজ দিচ্ছি, চামচ দিয়ে ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করো।"

ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েদের ভিড়ে এককোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে লছমী। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। ভয়বিহ্বল চোখে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে পার্বতীর দিকে।

লছমীর মাকে বকলাম, "ওই বাচ্চা মেয়েটাকে এখানে আসতে দিয়েছ কেন? এতটুকু আক্কেল নেই তোমাদের? শীগ্‌গীর নিয়ে যাও ওকে।"

লছমীর মা ওর হাত ধরে টানতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মেয়েটা। লেডী ডাক্তার আধঘন্টার মধ্যে এসে পড়লো। এম.আই. রুম'এর অ্যাম্বুলেন্স তার ক'মিনিট আগেই এসে গেছে, দরকার হলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হলো না। আরও কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া করে সন্তান প্রসব হলো, কিন্তু প্রসূতিকে বাঁচানো গেল না। শোকের ছায়া নেমে এলো ক্যাম্পে। পার্বতীর শাশুড়ী, ননদের সঙ্গে পাড়ার অন্যান্য আয়ারা গলা মিলিয়ে কাঁদলো। ছবিলাল কাঁদেনি। স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। উজ্জ্বল কালো চেহারার জৌলুস কোথায় হারিয়ে গেছে। ওকে ডেকে পঞ্চাশটা টাকা হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, পার্বতীর শেষ কাজটা যেন ভালভাবে হয়।

পার্বতীকে কত দিন কত কুকথা বলেছি, সেই ভেবে অনুশোচনা হলো আজ। ওর মৃত্যুর জন্যে খানিকটা দোষীও মনে হলো নিজেকে। হাসপাতালে ডেলিভারী হলে হয়তো এমনভাবে অসময়ে মরতো না সে। ক'মাস আগে পার্বতীকে বলেছিলাম মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা। ও ঠোঁট উল্টে জবাব দিলো, ওদের বংশে বাচ্চা বিয়োতে আজ পর্যন্ত কেউ হাসপাতালে যায়নি। হাসপাতালের নার্সরা জানেই বা কতটুকু। প্রসূতি যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে, নার্সরা এতটুকু মদত করে না। তিন হাত দূরে চেয়ারে বসে বসে মজা দেখে। বাচ্চা বেরিয়ে এলে তখন এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে ধরে শুধু। পার্বতীর সব জানা আছে। ক্যাম্পের মার্থা ঝানু ধাই, সে থাকতে হাসপাতালে যাবে কোন দুঃখে? তারপর আর কিছু বলিনি আমি। আজ মনে হল বড় ভুল করেছি।

নতুন দড়ির খাটিয়ায়, নতুন শাড়িতে মুড়িয়ে পার্বতীকে নিয়ে গেল ওরা। লোকজন ডেকে ভাল করে শ্রাদ্ধ করলো। ছবিলালের মা বাচ্চাটার দেখাশোনো করে। ক্যান্টিন থেকে এক টিন অস্টারমিল্ক ও একটা ফিডিং বট্‌ল্ এনে ছবিলালের হাতে দিলাম। আর কিছু পুরোনো বিছানাপত্তর। আমাদের বাড়ির কাজ লছমীই পুরোপুরি করে। তবু কোয়ার্টারে ছবিলাল থাকতে লাগলো।

সময় কারো জন্যে থেমে থাকে না। জীবনের দাবি মেটাতে শোক-তাপ চাপা দিয়ে আবার কোমর বেঁধে কাজে নামতে হয় মানুষকে। যে চলে গেছে তার তো সব প্রয়োজনই চুকে গেছে, কিন্তু যারা রইলো তাদের তাগিদ অত সহজে মেটে না।

এর কিছুদিন পরের কথা। ছবিলালের মা ও লছমীর মা দু'জনে এলো। ছোট বাচ্চাটাকে একটা তোয়ালে জড়িয়ে এনেছে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। কি ব্যাপার, বাচ্চার কিছু হয়নি তো? ওরা হেসে শান্ত করলো। ওরা নাকি এমনিই এসেছে। মাটিতে গুঁড়িশুঁড়ি হয়ে বসলো দু'জনে। লছমী ঝাড়ন হাতে চেয়ার টেবিলগুলো মুছছিল। ওদের দেখে ঘাড় হেঁট করে একমনে কাজ করতে লাগলো। বুড়ীই কথাটা ভাঙলো। ও নাকি গাঁয়ে চলে যাবে শীগ্‌গির। সেখান থেকে ছোট ছেলে তাগাদা দিচ্ছে। ফসলের সময় ও না থাকলে সব কুটে-ঝেড়ে তুলবে কে?

বললাম, "তা, তোমার নাতিকে দেখবে কে? ওকে কি সঙ্গে নিয়ে

যেতে চাও? ছবিলাল কি রাজী হবে?"

বুড়ী একগাল হেসে লছমীর মার দিকে ইশারা করলো। লছমীর মা ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বললো তার মর্ম হলো, ওরা নাকি লছমীর সঙ্গে ছবিলালের বিয়ে দিচ্ছে। ও তো এমনিতেও মেমসাহেবের কাজ করছে, এই কোয়ার্টারেই থাকবে ওরা। পান-দোক্তা খাওয়া দাঁত বার করে হাসলো রামসুখিয়া।

চমকে উঠে বললাম, "সেকি রে? লছমী তো এতটুকু কচি মেয়ে। ছবিলালের বয়স কম করে চল্লিশ নিশ্চয়ই হবে।"

বুড়ী হাত নেড়ে বললো, "না মেমসাব্, আমার ছেলের বয়স আটত্রিশের এক চুল বেশি নয়। হাট্টাকাট্টা জোয়ান এখনও। সে জন্যে ভেবো না। তা ছাড়া লছমীও ষোলোয় পা দিয়েছে। বিয়ের বয়স হয়ে গেছে তার। দু'একটা বাচ্চা বিয়োনোর পর বয়সের তফাৎ আর নজরে পড়বে না ---- ।"

ওদের ছেলে মেয়ের বিয়ে, আমার আর কি বলার আছে? আমার মত নিতে আসেনি ওরা, ভদ্রতা করে আগে ভাগে সংবাদটা দিতে এসেছে শুধু। তবু মনে মনে অস্বস্তি হতে লাগলো।

বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। লছমীর যেন আনন্দে মাটিতে পা পড়ে না আর। বিয়ের দু'দিন আগে থেকে ছুটি নিলো। সিল্কের ছাপা শাড়ি-ব্লাউজ কিনলাম ওর জন্যে।

খুব একটা সাজ-সরঞ্জাম হয়নি বিয়েয়। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে, মাত্র তিন মাস আগে বউ মরেছে, বেশি ধুমধাম করলে দৃষ্টিকটুই হতো সেটা। তা ছাড়া পয়সার টানাটানিও ছিল। ছবিলালের মা আড়ালে নীচু গলায় জানালো সে কথা - লছমীর বাবা মা নাকি বিশেষ খরচ-পত্তর করেনি। সে ক্ষমতাও নেই ওদের। তাতে বুড়ীর দুঃখ নেই। ছেলে তার বউ নিয়ে সুখে থাকুক। নাতিপুতিতে ঘর ভরুক। এর বেশি আকাঙ্ক্ষা নেই তার।

দু'তরফ থেকেই নেমন্তন্ন করেছিল। বিকেলের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের বাড়ির পিছনের লনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। ছোট খুপরি

ঘরটা লাল কাগজের মালা দিয়ে সাজানো। দরজার কাছে আধশুকনো দু'টো কলাগাছ। ঘরে শতরঞ্জির উপর এক গলা ঘোমটা টেনে বসে আছে লছমী। সালোয়ার পরা বিনুনি দোলানো ছোট মেয়েটা যেন এই ক'দিনে জীবনের ক'টা বছর পার হয়ে এসেছে। শতরঞ্জির এক পাশে পার্বতীর বাচ্চাটা শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষছে। শাড়ির প্যাকেটটা লছমীর হাতে দিয়ে চলে এলাম।

আরও কয়েকদিন পর থেকে লছমী যথারীতি কাজে যোগ দিলো। শাড়িতে, সিঁদুরে আর হাত ভর্তি কাঁচের চুড়িতে চেনাই যায় না ওকে। ছবিলালের মা দেশে ফিরে গেছে। ছবিলাল কিছু কিছু কাজ করে দেয়। সকালে ঝাঁটপাটটা ওই করে। তারপর লছমী বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসে বাকী কাজগুলো সারে। মাঝে মাঝে বাচ্চাটা জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয়।

লছমী বলে, " মেমসাব্, একটু দেখে আসি।"

কোন কোনদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বারান্দায় শুইয়ে আশেপাশে দু'একটা খেলনা দিয়ে আবার কাজে লাগে। ওর ভাগের চা থেকে চামচে করে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে বাচ্চাটাকে খাওয়ায়। ওরা ওর নাম রেখেছে অচ্ছেলাল।

সেদিনও বাচ্চাটাকে ছাদে শুইয়ে বাথরুমে কাপড় কাচছিল লছমী। শীতকাল। রোদে চেয়ার টেনে খবরের কাগজটা কোলের উপর রেখে অচ্ছেলালের কীর্তিকলাপ দেখছিলাম। সবে বসতে শিখেছে। হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গী করে নানারকম আওয়াজ করছে। বুঝলাম ওর দৈনিক বরাদ্দ বিস্কুট চাইছে। উঠতে আলসেমী লাগছিল। লছমীকে ডাকলাম, কোন জবাব পেলাম না। কাপড় কাচার আওয়াজও পাচ্ছি না। মেয়েটা অতক্ষণ ধরে করছে কি? মনে মনে বিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি বাথরুমের মেঝেয় একরাশ কাপড়ের স্তূপ পড়ে রয়েছে। লছমী এককোণে চুপ করে বসে আছে। মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ।

"কি হয়েছে রে?"

ও মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঙ্কের কাছে ছুটে গিয়ে হড়হড় করে বমি করতে লাগলো। খানিক পরে একটু শান্ত হলে ওকে মুখচোখ ধুতে বলে রান্নাঘর থেকে এলাচ নিয়ে এলাম।

বললাম, "এটা মুখে রাখো। একটু বিশ্রাম করো, এখন আর কাপড় কাচতে হবে না।"

ও দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

"মেমসাব্, আমি আর বাঁচবো না। আমি নিশ্চয় মরে যাবো।"

দু'একটা প্রশ্ন করে বুঝলাম ঠিকই অনুমান করেছি, মা হতে চলেছে সে।

বললাম, "কাঁদছো কেন, এতে ভয়ের কি আছে?"

কিন্তু সমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ও। বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বললাম, বাকী কাজ পরে ছবিলাল এসে করলেও চলবে।

বিকেলবেলা ছবিলাল এলো। তার মুখে-চোখে চাপা খুশী উপছে পড়ছে যেন। লছমী সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে বাধলো। এর পর থেকে ওরা দু'জনে পালা করে কাজে আসতো। লছমীর মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে। সব সময় মুখ শুকনো, যখন তখন চোখ মোছে। ওর বদ্ধমূল ধারণা যে পার্বতীর মত ছবিলালের সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই মরবে ও।

ছেলেমানুষ। মাত্র ষোলো কি সতেরো বয়স। সতীনের প্রসব-যন্ত্রণা নিজের চোখে দেখেছে, সে ছবি মনে গাঁথা হয়ে আছে। বড্ড মায়া হলো। বেচারী একে মা হওয়ার শারীরিক কষ্ট পাচ্ছে, তার উপর এই মানসিক আতঙ্ক। ওকে হাসপাতালের গায়নোকোলজিস্ট ক্যাপ্টেন সুধাকরের কাছে নিয়ে গিয়ে সব কথা বললাম। পার্বতীর মত অঘটন এ বেচারির বেলায় যেন না ঘটে। ভদ্রলোক যথেষ্ট সহানুভূতি নিয়ে দেখলেন ওকে। প্রতি মাসে চেক-আপের জন্যে আসতে বললেন। খাবার ও ওষুধপত্র সম্বন্ধে নানা নির্দেশ দিলেন। লছমীর জন্যে চায়ের বদলে দু'বেলা এককাপ করে দুধ বরাদ্দ করলাম। সামান্য ফল, মাখন, কোন কোন দিন একটু মাছ কি মাংস কিংবা একটা ডিম - মাগ্গীর বাজারে এটুকু করতেও বেশ টানাটানি পড়লো আমাদের সংসার খরচে। কিন্তু কি আর করা যায়, একটা মানুষের জীবনের প্রশ্ন যেখানে।

ওদিকে ছবিলালও যত্নের ত্রুটি রাখলো না। কোনও ভারী কাজ করতে দেয় না ওকে। বাচ্চার কাজ, রান্নাবান্না, আমাদের বাড়ির যাবতীয়

কাজ সব একা সামলাতে লাগলো। এত করেও কিন্তু কিছুতেই লছমীর ভয় ভাঙানো গেল না। সব সময় মুখ চুন করে থাকে, যেন ফাঁসীর আসামী।

ক্যাপ্টেন সুধাকর বললেন, "দ্যাখো ডেলিভারীর সময় কখনো কখনো মিসহ্যাপ হয় বটে, কিন্তু কিছু গোলমাল আছে কিনা সে কথা আগের থেকেই বোঝা যায়। গোলমাল থাকলেও হাসপাতালে ডেলিভারী হলে প্রাণের আশঙ্কা খুবই কম, কারণ সব রকম ব্যবস্থা আছে এখানে। এ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নেই। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সবকিছু স্বাভাবিক আছে। একদম নরমাল ডেলিভারী হবে তোমার। আর যদি ভবিষ্যতে আবার পোয়াতি হতে না চাও, তাহলে ডেলিভারীর পর অপারেশন করিয়ে নিতে পারো। খুব সহজ ব্যবস্থা আছে।

এ কথা শুনে লছমীর মুখে হাসি ফুটলো। এ যাত্রা কোনরকমে ফাঁড়াটা কেটে যাক, আর নয় বাবা। ছবিলালও মত দিলো। ঠিক হলো প্রসবের পর একেবারে অপারেশন করিয়ে বাড়ি আসবে।

লছমীর ডেলিভারীর যখন দু'মাস বাকী তখন আমাদের ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং'এর অর্ডার এলো। দশ দিনের মধ্যে আমার কর্তাকে জয়েন করতে হবে। জিনিসপত্র প্যাক, নতুন জায়গায় বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা, সবকিছু ছাড়িয়ে দুশ্চিন্তা হলো লছমীর জন্যে। এ অবস্থায় ওকে ছেড়ে যেতে হবে। পাশের ব্লকের স্কোয়াড্রন লীডার দত্তদের সঙ্গে আমাদের গলায় গলায় ভাব। অঞ্জলি বললো, "কিচ্ছু ভেবো না সুনীতিদি, আমাদের কোয়ার্টারটা তো খালিই আছে। ছবিলালকে বলো ওদের নিয়ে চলে আসুক। তোমার লছমীর দেখাশোনার ত্রুটি হবে না। সময়কালে হাসপাতালে ভর্তি করার দায়িত্ব নিলাম আমি। ক্যাপ্টেন সুধাকর রয়েছে, কোনও চিন্তা নেই তোমার।"

ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটে কাটলো আমাদের ক'মাস। বাড়ি, ঝি-চাকর কিছুই সুবিধে মত পাওয়া যায় না। এরপর আমায় আবার হাঁপানিতে ধরলো। এ সবের মধ্যে লছমীর খবরাখবর নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। এরপর আরও ক'টা বছর কেটে গেল। ব্যাঙ্গালোরে তিন বছর কাটিয়ে তারপর দিল্লী বদলি হলাম আমরা। সেখানে বছরখানেক থাকার

পর শুনলাম দত্তরাও বদলি হয়ে দিল্লী আসছে।

খুব আনন্দ হ'ল পুরনো বন্ধুদের আবার কাছে পাওয়া যাবে ভেবে। ওরা যেদিন দিল্লীতে এসে পৌঁছলো সেদিনই সন্ধ্যেবেলা গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ার ভরে লুচি ও মাংস নিলাম। হৈ হুল্লোড় ও আড্ডা চললো অনেকক্ষণ।

হঠাৎ মনে পড়লো আমার, জিজ্ঞেস করলাম, "লছমীর খবর কি?"

ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

বললাম, "সেই যে লছমী আর ছবিলাল; লছমীর ঠিকমত ডেলিভারী হয়েছিল তো?"

হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেলো অঞ্জলি। হাসি ও কাশির চোটে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। দত্ত ও আমার কর্তা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিল।

কথা থামিয়ে দত্ত জিজ্ঞেস করলো, "কি হল অঞ্জু?"

অঞ্জলি অতিকষ্টে বললো, "লছমী ---- ছবিলাল ---- তুমি বলো ---- উঃ। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ----।" বলে আবার মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগলো।

দত্তও হাসতে লাগলো, "বুঝলে হে রায়, এদের সেই আদরিণী আয়া যা ভেল্কী দেখালো ----। তোমরা যাওয়ার পর ওরা তিনজন আমাদের কোয়ার্টারে এসে উঠলো। দু'মাস ধরে খুব তোয়াজ করা হলো। একদিন অফিসে অঞ্জুর ফোন পেলাম, 'শীগ্‌গীর বাড়ি এসো, লছমীর লেবার-পেন শুরু হয়েছে। এক্ষুনি ওকে গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।' ল্যাও ঠ্যালা। পরের দিন ইন্‌স্পেক্‌শন্‌। আধঘন্টা পরে একটা মিটিং ডেকেছি। এখন সব ছেড়ে আমি ঝিকে প্রসব করাতে নিয়ে যাই। লোকে বলবে, 'বাছাধন, তোমারই বা এত ঝি'র প্রতি টান কেন? নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় করে বসে আছো ----।'"

অঞ্জু নালিশ জানায়, "দেখছো সুনীতিদি, কি রকম অসভ্য লোক ----।"

দত্ত বলে চলে, "আমি বললাম, অফিস থেকে ছুটি পাওয়া অসম্ভব। তুমি ছবিলাল ও লছমীকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাও। হাসপাতাল

বেশি দূরও নয়। ক্যাপ্টেন সুধাকর তো তোমার চেনা। লছমীকে ভর্তিটর্তি করাও, আমি চারটের সময় অফিস-ফেরতা তোমায় হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসবোখ'ন।"

অঞ্জু বললো, "বুঝলে সুনীতিদি, সোমবার বেলা একটায় হাসপাতালে ভর্তি হলো। সেদিন গেল, সারারাত গেল, পরদিন সমস্ত দিন কাটিয়ে রাত দশটায় ডেলিভারী হলো। কি কষ্ট যে পেয়েছে মেয়েটা! আমার তো মনে হচ্ছিল এও বুঝি মরবে পার্বতীর মত। বেচারা ছবিলাল, দু'দিন ধরে লেবার-রুমের সামনে থেকে নড়েনি, এক কাপ চাও খায়নি লোকটা। ঘরের ভিতরে লছমী পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই কাতরানি শুনে সমানে তড়পাচ্ছে মানুষটা।"

দত্ত টিপ্পনি কাটেন, "আর দু'দিন ধরে আমরাও নাকানি চুবোনি খাচ্ছি অচ্ছেলালকে নিয়ে। বুঝলেন মিসেস রায়, নিজের ছেলেদের কোনদিন কোলে নিলাম না জামাকাপড় ভেজার ভয়ে, আর বউয়ের হুকুম হলো কোলে নিয়ে খেলনা দিয়ে ঝিয়ের ছেলের কান্না থামাতে হবে। যত বলি লোকে অন্য কিছু ভেবে বসবে, কে শোনে সে কথা।"

অঞ্জলি ধমক লাগায়, "আঃ, থামো তো ! লোকে কি বলবে সে ভয়ে তো ঘুম নেই তোমার ! তারপর রায়সাহেব শুনুন। মঙ্গলবার রাত দশটায় ছেলে হলো। পরদিন ওকে দেখতে গেলাম আমরা। বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে, কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। অপারেশনের কথা নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললো, লছমী নাকি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেছে। অথচ সোমবারদিন যখন ভর্তি হলো, তখনো তাই ঠিক ছিল। ক্যাপ্টেন সুধাকর বললেন, রুগীর মত ছাড়া অপারেশন করার নিয়ম নেই। প্রসব যন্ত্রণার মধ্যেও নাকি নার্সের হাতে পায়ে ধরে বার বার বলেছে অপারেশন যেন কিছুতেই না করা হয়। তখন সবাই ভেবেছিল বুঝি ভয় পাচ্ছে কাটা ছেঁড়া করাতে। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সুধাকর, কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষে ছবিলালকে ডেকে বললেন বউকে বোঝাতে, কারণ ডেলিভারীর পরই সুযোগ, অন্যসময় অনেক বেশী কষ্টসাধ্য এ অপারেশন। কিছুতেই মানলো না লছমী।

ওরা আর কি করবে? একে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা, জোর-জবরদস্তি করার সময় নয় এটা।

ক্যাপ্টেন সুধাকর ছবিলালকে বললেন, "ঠিক আছে, তুমিই বরং ভ্যাসেক্টোনমি করিয়ে নিও। দু'জনের মধ্যে একজনের যদি সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট করা যায় তাহলেই হল।"

ছবিলাল এক কথায় রাজী। পরের সপ্তাহেই দিন ঠিক হলো। বেশী দেরি করতে চায় না ছবিলাল। বউ চাঙ্গা হয়ে ওঠার আগেই এ ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চায়। বলা যায় না আবার পদস্খলন হতে কতক্ষণ?

অঞ্জলি থেমে স্বামীর দিকে তাকালো।

দত্ত খেই ধরলেন, "চারদিন পর ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলো লছমী। তার ক'দিন পরের কথা। আগের রাত্রে পাঠানকোট থেকে টেম্পোরারি ডিউটি সেরে ফিরেছি। সেদিন বাড়িতেই ছিলাম। হঠাৎ সারভেন্টস্ কোয়ার্টার থেকে কান্নাকাটি চিৎকার শোনা গেল। দেখতে দেখতে পাড়ার ঝি ও তাদের বাচ্চা-কাচ্চা মিলে বেশ ভিড় জমে গেল, ক্রমে পুরুষরাও জুটলো এসে। এদিকে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরই সারভেন্টস্ কোয়ার্টারে। একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। প্রথমে বলতে চায় না, শেষে শুনলাম লছমী নাকি গলায় দড়ি দিচ্ছে।

ঘাবড়ে গেলাম, 'দিচ্ছে, না দিয়েছে?'

লোকটা বললো 'এখনও দেয়নি, তবে দেবে বলে শাসাচ্ছে।'

"ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা জানা গেল। ছবিলাল নাকি সকালে কাজে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছে। খানিক আগে অন্য এক সুইপারের কাছে খবর পেয়েছে যে, ছবিলাল মোটেও কাজে যায়নি, গেছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টারে। সেখান থেকে পুরুষত্ব ঘুচিয়ে 'খাসি' হয়ে ফিরে আসবে সে। লছমী অনেক বুকটুক চাপড়িয়ে তারপর গলায় দড়ি দেওয়ার তোড়জোড় করছিল। ছবিলালের সহকর্মীরা ওকে আশ্বাস দিয়েছে যে ওর স্বামীকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে ওরা। চারজন লোক অলরেডী সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, আর তাদের মুখ চেয়ে গলায় দড়িটা মুলতুবি রেখেছে লছমী। এর ঘন্টা-দুয়েক পর প্রায় জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে এলো লোকগুলো। ছবিলালকে অপারেশন টেবিল থেকে তুলে এনেছে ওরা, আর দু'মিনিট দেরি হলেই অঘটন ঘটে যেতো।

পরিবর্তে ওরা কিছু আশা করেছিল কিনা জানি না। হয়তো ভেবেছিল লছমী কমপক্ষে ওদের চা-টা করে খাওয়াবে, কিন্তু লছমী সে সবের ধার দিয়েও গেল না। স্বামীকে ঘরে ঢুকিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো সবার মুখের উপর ----।"

"বোধহয় কিছু ড্যামেজ হয়েছে কিনা, সেটা হাতে-কলমে যাচাই করতে চায়।" ফোড়ন কাটলো আমার কর্তা।

আমি বললাম, "চুপ করো। মুখে কিছুই বাধে না তোমাদের।"

দত্ত বললো, "যাই বলো তোমরা, স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসতে ওরাই পারে। আমাদের বউরা তো ফ্যামিলি বাজেট, ফিগার, এই সব দুশ্চিন্তা নিয়েই গেল। আরে বাবা, সবদিক বজায় রেখে কি আর ভালবাসা যায়?"

অঞ্জু বললো, "রাখো তোমার ভালবাসা। শাস্ত্রে বলে গেছে কোন কিছুতেই আতিশয্য ভাল নয়। বছর বছর ভালবাসার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে গোটা দেশটাই ডুবতে বসেছে ----।"

"তারপর লছমীর কি হলো?" জানতে চাইলাম আমি।

অঞ্জু বলে, "এর পরও শুনতে চাও সুনীতিদি? এ তো একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার। পার্বতীর ছেলেটা দেড় বছর তখন। ওর ছেলে - তার নাম রেখেছে শোভনলাল, শখেরও বলিহারি - বোধহয় মাস ছয়েক; লছমীর পেটটা মনে হলো বেশ উঁচু দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করাতে বললো, পাঁচ মাস চলছে। বললাম, এখনও তো মাসকয়েক বাকী আছে, এই বেলা অন্য কোয়ার্টার দেখো। ওরা কোয়ার্টার খালি করে চলে গেল। তারপরই তো নাগপুরে চলে গেলাম আমরা। এতদিনে বোধহয় আধডজন-খানেক লালের আমদানি হয়েছে ওদের সংসারে ----।"